বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা

BANGLADESH UNIVERSITY OF ENGINEERING & TECHNOLOGY, DHAKA

The Daily Star Special Supplement February 29, 1992 প্রচার এবং অলংকরণে – ক্যামেলিয়া এ্যাড (প্রাঃ) লিঃ

তৃতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠান ১৯৯২

একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তি

আ. মু. জহুরুল হক
ড: রশীদ প্রফেসর

এই শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের শুরুর দিকে এক মার্কিন লেখক একখানা বই লিখে নাম দিয়েছিলেন 'নতুন দিনের নয়টি পথ' (Nine Roads to Tomorrow)। ঠিক ঐ সময়ে, এই শতাব্দীর বাকি চল্লিশ বছরের মধ্যে প্রায়োগিক বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির জগতে যে সব কর্মকাণ্ড ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছিল এবং যাদের ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনা জগৎ-জোড়া সব মানুষের জন্যে বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপে প্রচুর, এবং প্রকৃতপক্ষে প্রায় অকল্পিত, উপকার বা সুবিধা এনে দেবে বলে মনে হচ্ছিল, তাদের মধ্যে ন'টি ব্যবস্থাকে বেছে নিয়ে তাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তিনি দিয়েছিলেন। এই নয়টি পদ্ধতি বা ব্যবস্থাকে তাঁর অনুর ভবিষ্যৎ সময়ের জন্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল। সেই ভবিষ্যৎ চল্লিশ বছর প্রায় শেষ হয়ে এলো: আমরা শতাব্দীর শেষ দশকের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। স্বাভাবিকভাবেই মনে জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল জাগে, যে সব কার্যকলাপের প্রচুর সম্ভাবনা ছিল বলে মনে হয়েছিল, তারা কি সব মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছিল, পেরেছে? যেহেতু দেশে দেশে বিজ্ঞান প্রযুক্তির অভিযান বিরামহীনভাবে এগিয়ে চলেছে, সেহেতু সম্মুখে চলার পথে এক প্রশ্ন থেকে অন্য প্রশ্ন উঠেই চলেছে, এক জ্ঞান থেকে অন্যান্য জ্ঞান, এক উপলব্ধি থেকে ব্যাপকতর উপলব্ধি। ইতিমধ্যে বিগত তিনটি দশক থেকে নূতন কি প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা উঠে এলো, কোন্ ধরনের উপলব্ধি, কোন্ অনুসন্ধানের পথ? কোন্ দিকের সম্ভাবনা কিছুটা ম্লান হয়ে এলো, যদি তা হয়ে থাকে? কোন্ দিকের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হলো? জীবনের সামগ্রিক কল্যাণ, উপকারের জন্যে কোন বিশেষ দিকের জন্যে সচেতনতা, সতর্কতা এবং সমাধানের প্রয়োজনটা হয়ে উঠলো বেশী জরুরী, তাৎক্ষণিকভাবে অপরিহার্য? আমরা জানি, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কার্যকলাপ পরস্পর-সহায়ক, যার ফলে সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সামগ্রিক ফলাফলটি হয় ক্রমবর্ধিষ্ণু (Cumulative); এক ফল আর এক ফলের সঙ্গে শুধু যুক্ত হয়না, যৌথ ফলটি হয় আনুপাতিক হিসাবের চেয়ে অনেকটাই বেশী। আবার অন্যদিকে এ-ও প্রতীয়মান হয় যে, পরবর্তী স্তরের ফলাফল বা পরিকল্পনা অগ্রবর্তী স্তরের কর্ম ধারাকে পুনর্মূল্যায়নের প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রিত, এমন কি, নির্ধারিত করতে পারে। অনিবার্য এই প্রক্রিয়াটিকে বিজ্ঞান প্রযুক্তির ভাষায় বলা হয় পশ্চাৎ পোষণ (Feed back)। ভবিষ্যতে কী হতে যাচ্ছে, সে সম্বন্ধে তথ্যভিত্তিক (informed) জল্পনা-কল্পনা, এখনকার গুরুত্বপূর্ণ কার্যকলাপকে কল্যাণের, অন্ততঃ সুবিধার, পথে নিয়ন্ত্রিত করে রাখতে পারে। প্রকৌশলী প্রযুক্তিবিদ এই অনস্বীকার্য আবদ্ধ চক্রটি (closed cycle) সম্বন্ধে সচেতন না হলে, তার ক্রিয়াকলাপ-হয়তো বা জীবন সমর্পিত কার্যধারাও-পরিণামে তার নিজের এবং তার পরিবেশের সমাজ জীবনে সন্তুষ্টির জন্য দিতে পারবেনা। গোটা একটা জীবনের নিবেদিত শ্রমপূর্ণ ক্রিয়া-কাণ্ড পরিশেষে উদ্দেশ্যহীন, ছন্ন ছাড়া, ফুৎকারে উড়ে-চলা ধূলিকণার মতো দেখাবে।

প্রযুক্তি জগতে বিশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ (ঐ লেখকের বিবেচনায়) ছিল এই সব (১) লেজার (২), কমস্যাট, (৩) আধুনিকতম কম্পিউটার; (৪) অতি শৈত্য বিজ্ঞান (Cryogenics), (৫) জৈব শক্তি, (Bio-Power), (৬) সৌর শক্তি, (৭) ভূক্রিয়া যান (Ground Effect Machine, বা Hover craf), (৮) শ্রবণাতীত বিজ্ঞান (Ultrasonics), (৯) জৈব প্রক্রিয়াসম বিজ্ঞান (Bionics)। বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞান প্রযুক্তির উদ্ভাবন, গবেষণা, নির্মাণ এবং ব্যবহার নিয়ে যে সব বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদ কর্মরত আছেন তাদের কাছে গত তিন দশকের অর্জিত অভিজ্ঞতার পটভূমিতে উপযুক্ত ন'টি নাম এখন খুবই পরিচিত; তাদের সব'টির অগ্রগতি বা ব্যবহার ক্ষেত্রে বিস্তৃতি হয়তো সমান হয়নি। কিন্তু বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদ তো তাদের অস্তিত্ব ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে ভালোভাবে জানেনই, প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে বিজ্ঞান প্রযুক্তি দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশে সাধারণ নাগরিকরাও অন্ততঃ ঐ সব ব্যবস্থা বা দ্রব্যের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনে কী কী এবং কোন ধরনের 'সুবিধা' পাওয়া যাবে, সে সম্বন্ধে অবহিত। পৃথিবীর সব দেশে বিজ্ঞান প্রযুক্তির সার্বিক অনুশ্রবণ এবং বিস্তৃতিই এই অবহিতির পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে - যদিও সব দেশে সকলের কাছে, নানান কারণে তাদের সহজ বা সর্বজনসাধ্য প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয়নি।

বিশ শতকের শেষ দশকের শুরুতে, পৃথিবীর এই অংশে বাস করে আমরা, যে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছি এবং পেয়েছি তা থেকে এখন বলা অসংগত হবেনা যে সম্ভাবনাপূর্ণ, এ নয়টি 'পথের' মধ্যে প্রথম তিনটি পদ্ধতি বা ব্যবস্থা এই অঞ্চলেই ইতিমধ্যে লভ্য এবং সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। বিভিন্ন হাসপাতালে-প্রতিষ্ঠানে লেজারের সাহায্যে অনুসন্ধান কাজ বা শল্য-চিকিৎসার কথা এখন প্রায়ই শোনা যাচ্ছে। 'কমস্যাট' বা যোগাযোগের কাজে উপগ্রহের ব্যবহারের ফলে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের সঙ্গে তাৎক্ষণিক টেলিফোন, ফ্যাক্স, টেলেক্স সংযোগ এখন মোটামুটিভাবে সহজলভ্য দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জৈব শক্তি বিষয়ে এদেশে খুব ভালো কোনো গবেষণা-উদ্ভাবন কাজ হচ্ছে কিনা জানা যায় নি; আমার যতদূর জানা আছে, এখনো গুরুত্ব দিয়ে বৃহদাকার কিছু করা হয়নি, যদিও এদেশের আবহাওয়া ও প্রকৃতিতে এক্ষেত্রে সম্ভাবনা খুব ভালো বলে মনে হয়। অবশ্য সৌরশক্তির ওপরে বেশ কয়েক বৎসর ধরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে। গবেষণা বা উদ্ভাবনে কোথাও কিছু সফলতার সংবাদ পাওয়া গেলেও বৃহৎ ক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহারের আয়োজন-পরিকল্পনার সংবাদ এখনো পাওয়া যায়নি, যেমন অতি-উন্নত, উন্নত এমন কি অনুন্নত কয়েকটি দেশে বর্তমানে স্থাপিত হয়েছে। দেশের সরকারী মহল থেকে নিবেদিত উৎসাহদান অনুদানের অভাবই এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে আছে বলে মনে হয়।

এদেশের আর্থিক সংস্থানের অভাবেই ভূক্রিয়া-যান বা (হোভারক্র্যাফট) ভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনো সামান্য মাত্রাও গড়ে ওঠেনি, যদিও এদেশের ভৌগলিক-প্রাকৃতিক পরিস্থিতিতে এ ধরনের ব্যবস্থা খুবই উপযোগী বলে প্রমাণিত হয়েছে। গত বছরের গোড়ার দিকে প্রচণ্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরে এক অন্য দেশীয় সরকারের প্রেরিত এই জাতীয় যন্ত্র-যান, বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলীয় জলাভূমিতে, খুবই সন্তোষজনকভাবে সাফল্য এনেছিল। এ দেশের আর্থিক সংগতি, হয়তোবা সুদূর ভবিষ্যতে প্রচুরভাবে উন্নতির মুখ না দেখতে পেলে, এ জাতীয় যানবাহনের অন্ততঃ আংশিক প্রচলনও দেখা যাবে বলে মনে হয় না।

বিপুলভাবে শিল্পায়িত উন্নত দেশগুলিতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জৈব বা উদ্ভিদ জগতের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ যান্ত্রিক বা ইলেকট্রন-নির্ভর কতো প্রকার ব্যবস্থা বা পদ্ধতি যে চালু আছে, এবং নতুনভাবে উদ্ভাবিত হচ্ছে, দেখলে অবাক হতে হয়। যন্ত্রের এই জীবন সাদৃশ্যকেই 'বায়োনিকস' বলা হয়ে থাকে, সবারই জানা আছে এ প্রসঙ্গে অতি সংক্ষেপে এই মন্তব্য করা সঙ্গত হবে যে, যেহেতু নানা কারণে এদেশে এখনো অত্যন্ত জটিল বা সূক্ষ্ম প্রযুক্তির যন্ত্র নির্মাণের শিল্প গড়ে ওঠেনি (প্রধানতঃ সংযোজন-অভিযোজন-অনুকরণের কাজই চলছে) সেহেতু এই সম্ভাবনাটা খুব বাস্তবায়িত হয়নি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এদেশের স্বকীয় নির্মাণ শিল্প স্থাপিত হয়ে গেলে, অনিবার্যভাবে এই সম্ভাবনাটি আগামী শতকের কোনো এক সময়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। একইভাবে পূর্বোল্লিখিত কয়েকটি প্রযুক্তি, এখনো যেগুলি এই দেশে অন্ততঃ খুব দৃশ্যমান নয়, আগামী শতকে তাদের নিজস্ব গুরুত্ব নিয়ে জীবনে স্থান করে নেবে। এদেশেও তাদের অগ্রগমন, সমান গতিতে না হলেও, চলতে থাকবে।

ওপরের মন্তব্যের সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে ঐ সব প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা এবং উন্নতির কাজ করতে করতেই বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদ এবং সাধারণ মানুষের সমাজ বিগত তিন দশকে আরো কয়েকটি জরুরী ব্যাপার সম্বন্ধে অবহিত এবং সচেতন-সতর্ক হয়ে উঠেছে। শুধু সচেতনতা-সতর্কতারই জন্ম হয়নি, প্রকৃত পক্ষে কয়েকটি সমস্যা এবং পরিস্থিতি এই মুহূর্তে মানুষের সমাজের জন্যে এক একটি জীবন মরণ সমস্যার রূপ নিয়েছে। প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে, এখনই, এই মুহূর্তেই, এই রকম কয়েকটি সমস্যার দিকে মনোনিবেশ না করলে, না করতে চাইলে, পৃথিবী জোড়া মানবজাতির প্রভূত ক্ষতি হয়ে যাবে, এমন কি অল্পকালের মধ্যে মানুষ প্রজাতির নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। তাই বিশ শতাব্দীর শেষ কয়েক বৎসরে পরিষ্কার হয়ে উঠেছে আগামী একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদ গোষ্ঠীর প্রথম ও প্রধান কাজ কী কী হবে, কী হওয়া উচিৎ। বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদ যদি তার পরিপার্শ্বের মানব-জৈব-উদ্ভিদ জগতের কল্যাণের প্রতি নিবেদিত হয়, তা হলে এই সব নতুনতর কাজের মধ্যে নিজেদেরকে নিয়োজিত করা ছাড়া উপায় নেই। নীচে এমনি কয়েকটি "নবাদিত" সম্ভাবনার কথা বলা হলো। তালিকা সম্বন্ধে বিভিন্ন মহলের মতভেদ থাকতে পারে; এগুলি বর্তমান লেখকের মনোভঙ্গির সৃষ্টি, এ কথা মনে রাখতে হবে। মনে হয়েছে, এগুলিকে তাদের গুরুত্বের ক্রমানুসারে সাজানো এই মুহূর্তে আবশ্যক নয়, কেননা, সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে তুলনামূলকভাবে তাদের গুরুত্বের মান কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে।

সব কিছু বিবেচনা করে মনে হয়, এই পাঁচটি ব্যাপারে আগামী শতাব্দীতে (এবং তার পরের কয়েকটি শতাব্দী ধরেও) বিজ্ঞানী-প্রযুক্তিবিদরা গবেষণা, উদ্ভাবন, বাস্তবায়ন ও পৃথিবীর সব মানুষের জন্য ব্যবহারিক প্রয়োগে, ব্যাপৃত থাকবেন। বর্তমান পৃথিবীর 'অবস্থা' মানুষ তার কৃত কাজের ভিতর দিয়ে, যেখানে এই সময় নিয়ে এসেছে, তাতে আগামী দিনের বিজ্ঞান প্রযুক্তিবিদদের কাজকে শুধু জ্ঞান অর্জনের, কৌতূহল বা শখ মেটানোর, এমন কি জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে বললে যথেষ্ট হবেনা--মানুষ প্রজাতিটিকে এই পৃথিবীর বুকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইলে এই দায়িত্বগুলি 'কর্তব্য' হিসাবে পালন না করলে মানুষ নামের জীবটির কথা কয়েক শতক বা 'সহস্রক' এর পরে হারিয়ে যাওয়া ডাইনোসরদের মতো করেই বই পুস্তকে লেখা হবে--অবশ্য তখন বই পুস্তক থাকলেঃ-

(১) মানব জীবনের পরিবেশ সচেতনতা গত চার দশকের দান বা সৃষ্টিঃ প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও লেখিকা র‍্যাচেল কারসনের নামটি এ প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণীয়। ঘিরে থাকা পৃথিবীর সামগ্রিক পরিবেশটি কতো বিভিন্ন দিক ও মাত্রায় জটিলতায় প্রতিটি মানুষের সঙ্গে অচ্ছেদ্য গভীরতায় সংযুক্ত সম্পৃক্ত তার দিকে ঐ লেখিকাই মানব সমাজের চোখ ফুটিয়ে তোলেন। তার ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই, কিন্তু এই সামান্য কয়েকটি দশকের অনুধাবনে মানুষ যে সাতটি পরিবেশ মণ্ডলকে সনাক্ত করতে পেরেছে, যে সম্বন্ধে একালের প্রত্যেকটি বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদের অবহিতি অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। পরিবেশের এই মণ্ডলগুলি হলোঃ (ক) ভূ-মণ্ডল বা মৃত্তিকা মণ্ডল, (খ) জলমণ্ডল, (গ) বায়ু মণ্ডল, (ঘ) অগ্নিমণ্ডল (সৌরমণ্ডলকে ধরে), (ঙ) জীবন-মণ্ডল (জীবজন্তু, কীট পতঙ্গ এবং উদ্ভিদ জগতকে নিয়ে), (চ) বিশার ভূযার মণ্ডল ; পরিবেশের এই সব কিছুকে আবৃত-আচ্ছন্ন করে; (ছ) মনোজগৎ বা বোধ মণ্ডল। সামগ্রিক পরিবেশটির মণ্ডল সমাহার সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই। শুধু এদিকটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হলেই চলবে যে এমন কোনো জাতের বা ধরনের বিজ্ঞানী বা প্রযুক্তিবিদের কল্পনা একালে--আগামী শতাব্দীতে--করা সম্ভব নয় যিনি এ সাতটি মণ্ডলের সঙ্গে তাঁর কার্যকলাপে কোনো না কোনো ভাবে জড়িত, সম্পৃক্ত হবেন না। এবং এ কথা মনে রাখা আবশ্যিকভাবে প্রয়োজন হবে যে, কোনো এক শ্রেণীর বা স্তরের বিজ্ঞান প্রযুক্তি ভিত্তিক কাজ অন্য জগতের কাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, হলে চলবেনা। মানুষের আদি কাল থেকে বিশ শতাব্দী পর্যন্ত সমস্ত বিজ্ঞান-প্রযুক্তির সব চাইতে বড়ো অবদান এটাই; অবিচ্ছিন্নতার বোধের জন্মদান। "ওজোন খাদ" এবং "গ্রীন হাউস এফেক্ট"-সম্পর্কে কার্যাবলী, উদাহরণতঃ স্মরণযোগ্য।

(২) আলোচ্য সময়কালের মধ্যে, সভ্য মানুষের সমাজের জন্যে শক্তির (Energy) যথেষ্ট সংস্থান করতে পারার জরুরী সমস্যাটাও প্রকট এবং মারাত্মক হয়ে উঠেছে, সবারই তা জানা আছে। শক্তি ঘাটতি (Energy crisis) সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন এখানে নেই-বিশেষ করে প্রযুক্তিবিদরা এ ব্যাপারে খুবই সচেতন এবং তৎপর। কতো প্রকারের উৎস থেকে-ভূ-মণ্ডল, জলমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল, এমন কি জীবন মণ্ডল থেকে-সামান্যতম পরিমাণ হলেও, স্বল্পতম ব্যয়ে, শক্তি উদ্ভাব করা যেতে পারে, এই অনুসন্ধান প্রায় সকল জাতের প্রযুক্তিবিদকে চিন্তিত এবং ব্যস্ত রেখেছে, এবং এই অনুসন্ধান চলতেই থাকবে বলে অনুমান করা যায়, যতোকাল সংঘবদ্ধ মানব সমাজ অস্তিত্বশীল থাকবে। উল্লিখিত দু'ধরনের সমস্যা যে পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত তা বলাই বাহুল্য।

(৩) সব মানুষের খাদ্য সংস্থান করার সমস্যা বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদকে ভূমণ্ডলের উদ্ভিদ জগৎ ও সমুদ্রের প্রতি গভীরভাবে নিবেদিত করবে। সমুদ্রের মধ্যে অতি বিশাল এক খাদ্য ভাণ্ডার 'অপেক্ষা' করে আছে, তা উপলব্ধি করার প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। (বিজ্ঞান প্রযুক্তির একটি অভ্রান্ত, কিন্তু অনিবার্য অবদান এ-ও হবে; সকল মানুষের মধ্যে খাদ্য বস্তুর সুষম, সন্তোষজনক বণ্টন ব্যবস্থা বিজ্ঞান--প্রযুক্তিরই দায়িত্ব, তা প্রযুক্তিবিদরাও উপলব্ধি করবেন)।

(৪) তৃতীয় ঐ বিষয়টির সঙ্গে অপরিহার্যভাবে জড়িত মানবসমাজের জন্যে সন্তোষজনক বাসস্থানের সুব্যবস্থা করতে পারা। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে, অনুন্নত দরিদ্র দেশসমূহে স্বল্পব্যয়ে প্রচুর সংখ্যক বাস গৃহ নির্মাণ, সুবিধাজনক যাতায়াতের পথঘাট, সুবিন্যস্ত শহর ও গ্রামীণ পরিপার্শ্ব তৈরী করা এ কালের সচেতন ও দায়িত্ববান স্থপতি ও পরিকল্পনাবিদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ যুগের সচেতন জনগণকে খাদ্য ও সন্তোষজনক বাসস্থানের জন্য মৌলিক দাবী থেকে বিরত রাখা আগামী সময়ে ক্রমেই বেশি করে দুরূহ হয়ে পড়বে। সে দিক থেকে বিবেচনা করলে যে কোনো দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চাহিদা ও দাবি থেকে বিজ্ঞানী প্রযুক্তিবিদদের বিচ্ছিন্নভাবে দেখা একেবারেই এ যুগে সম্ভব হবে না।

(৫) বিশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধাংশ থেকে প্রযুক্তি কি ভাবে কতোখানি চিকিৎসা বিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে, তাবলে অবাক হতে হয়। এখনকার চিকিৎসা-ব্যবস্থায় নানান ধরনের জটিল ও সূক্ষ্ম অনুসন্ধান-বিশ্লেষণ-সনাক্তকরণ কাজে (diagnosis) প্রযুক্তি-উদ্ভূত নানান প্রকার যন্ত্রপাতি ছাড়া সঠিক চিকিৎসার দিকে এগোনোই সম্ভব হয়না। এক্ষেত্রে বিভিন্ন আধুনিক ব্যবস্থার উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে এখনো বেশ কয়েক ধরনের ব্যাধির সন্তোষজনক চিকিৎসা সম্ভাবনা হয়নি; ক্যান্সার, হৃদরোগ, মস্তিষ্ক বিকৃতি, স্নায়ু-বিকলতা, মানসিক/শারীরিক পঙ্গুত্ব ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির বিস্তৃততর ব্যবহারের সাহায্যে চিকিৎসায় আরো কতোটা সাফল্য লাভ করা যায়, তার চেষ্টা চালানো একবিংশ শতাব্দীর একটা প্রধান কাজ হবে, ধারণা করা যায়।

উপরে যে কয়টি বিশেষ প্রযুক্তির উল্লেখ করা হলো, সে সব কয়টির মধ্যে একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষণীয় হবে যে, মানুষের যথাযথ "কল্যাণ ও উন্নয়নের" কথা চিন্তা করেই এগুলির দিকে নজর দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 'ক্রমবর্ধিষ্ণু' বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিগত শতাব্দী পর্যন্ত সমস্ত সম্মিলিত অবদানের শ্রেষ্ঠতম ফলাফল হলো এইটিঃ মানবসমাজের সামগ্রিক কল্যাণ। কখনো কখনো কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির স্বার্থ ভিত্তিক এবং ধ্বংসকারী অপব্যবহার যে হয়নি, তা নয়; কিন্তু সেগুলিকে সামগ্রিক বিবেচনার সামগ্রিক বিপর্যয়-বিভ্রান্তি বা 'ব্যাপ্তিতা' ধরে একালের, সামনের শতাব্দীগুলোর, বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদগণকে সুস্থির ও সুচিন্তিতভাবে পা ফেলতে হবে, এগিয়ে যেতে হবে।

সমাবর্তন উৎসবের আলোকে

এ, এস, এম, আসরাফুল হক

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে আজ সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দেড় দশকেরও অধিককাল পর এই সমাবর্তনের আয়োজন। নিঃসন্দেহে এটা এক সুদীর্ঘ সময়। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে আজকের সমাবর্তন হচ্ছে তৃতীয় সমাবর্তন। '৬২ সালে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর প্রথম সমাবর্তন করা হয়েছিল ১৯৭৩ সনের ২০ শে মার্চ। এরপর দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয় এর তিন বছর পর '৭৬ সনের ১২ই নভেম্বর। এখানে একটা বিষয় অতিশয় প্রণিধানযোগ্য যে, পাকিস্তান আমলে বিশ্ববিদ্যালয় চালু হলেও দশ বছর সময়ের মধ্যে কোনও সমাবর্তনের আয়োজন করা হয়নি। '৭৩ সালের প্রথম সমাবর্তনে ২২২৪ জন স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রকৌশলী সনদপত্র লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয় সমাবর্তনে সনদপত্র গ্রহণ করেছিলেন ১৪৩৫ জন। এ বছরের সমাবর্তনে যারা সনদপত্র পাবেন তাদের সংখ্যা এক কথায় বিশাল হওয়া স্বাভাবিক। কেননা '৭৪-'৭৫ সেশন হতে শুরু করে '৮৭-'৮৮ সেশন পর্যন্ত এই ১৪টি শিক্ষা বর্ষের উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা আজ সনদপত্র নেবেন। এ সময়কালে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা হচ্ছে ৬২৪৪ জন। এদের মধ্যে স্নাতক পর্য্যায়ে রয়েছেন ৫৭৩০ জন এবং স্নাতকোত্তর পর্য্যায়ে ৫১৪ জন। তবে আজকের সমাবর্তনে যোগদানকারীর সংখ্যা হয়তো এত বৃহৎ হবে না। এ পর্যন্ত ৩১৮৫ জন সমাবর্তনে সনদপত্র গ্রহনের জন্য প্রয়োজনীয় নিবন্ধন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাবর্তনকে কেন্দ্র করে নূতন ও পুরাতনদের মিলনকেন্দ্র হয়ে উঠবে। অপরূপ সাজে সজ্জিত প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। ভবিষ্যতেও যারা প্রকৌশলী হবার আকাঙ্খা নিয়ে বেড়ে উঠছে সে সব তরুণদের কাছে এই সমাবর্তন হয়ে উঠবে এক অনাবিল অনুপ্রেরণার উৎস। ইতিমধ্যে চারদিন ব্যাপী এক উৎসবেরও আয়োজন করছে "বুয়েট"। "বুয়েট উৎসব '৯২"। এই উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন ক্রীড়াংগন, মীনাবাজার, স্মৃতিচারণ, মুক্ত আলোচনা, কৌতুক, ম্যাগাজিন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে। মোটকথা সমাবর্তনকে কেন্দ্র করে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন যান্ত্রিক জীবনে এক অনুপম আনন্দের রেশ ছড়িয়ে পড়েছে। এ ধরনের ব্যাপকভিত্তিক অনুষ্ঠান প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

সমাবর্তন প্রতি শিক্ষা বর্ষে না হলেও এ ধরনের দীর্ঘ বিরতি দিয়ে অনুষ্ঠান করা অবশ্য সমীচীন নয়। প্রতিটি শিক্ষার্থী তার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ করে অধীর প্রতীক্ষা নিয়ে সমাবর্তনের জন্য দিন গুনে যাচ্ছেন। কিন্তু এভাবে যদি এক বছর, দু বছর করে চৌদ্দটি বছর অতিক্রান্ত হয়ে যায় তাহলে একবুক হতাশা তাকে দগ্ধ করে। দুঃখজনক হলেও এ সত্যটি না বলে উপায় নেই যে আমাদের দেশের বেশীরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন হতে পারছে না। একটা না একটা জটিলতা লেগেই রয়েছে। শিক্ষাংগনে আজ সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলা নূতন কোন বিষয় নয়। আমাদের সমাজ জীবনে শিক্ষাংগনের অস্থিরতা বর্তমানে প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ সমস্যার আশু অবসান আজ সকল মহলের কাম্য। দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান সকল বিতর্কের উর্ধ্বে। এক গৌরবময় ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করে এই বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু সেখানে আজ এই মুহূর্তে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের চিন্তা মনে হয় কেউ অনুধাবন করতে পারছেন না। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। দেশের এই সার্বিক পরিস্থিতির আলোকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের এই উদ্যোগ শিক্ষাংগনে সুস্থ পরিবেশ বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। এখানে নানা সীমাবদ্ধতা ছিল, ছিল নানা ধরনের প্রতিকূলতাও। কিন্তু সবচেয়ে সুখের কথা যে, সকল প্রতিবন্ধকতার চৌহদ্দি পেরিয়ে আমরা সমাবর্তন অনুষ্ঠান করতে সক্ষম হয়েছি। দীর্ঘকাল পর দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ধরনের একটি গণতান্ত্রিক পরিবেশের জন্য দেশবাসী বহু বছর অপেক্ষমান ছিল। গণতন্ত্রের এই অগ্রযাত্রায় শিক্ষাংগনে তার বহিঃ প্রকাশ ঘটবে এটা দেশবাসীর কামনা। আজকের এই সমাবর্তনের মাধ্যমে গণতন্ত্রপ্রিয় দেশবাসীর আশা আকাংখা মূর্ত হয়ে উঠুক। আজকের সমাবর্তনের চ্যান্সেলর গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হিসেবে আজকে হবে তার ক্যাম্পাসে প্রথম আগমন। আমরা তাকে জানাই আমাদের উষ্ণ অভিনন্দন।

এবারে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকটি দিক সম্পর্কে আলোকপাত নিশ্চয় কিছু অপ্রাসংগিক হবে না। আমাদের ন্যায় একটি উন্নয়নশীল দেশে প্রকৌশল ও কারিগরী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। দেশের সামাজিক উন্নয়নে দক্ষ ও কুশলী প্রকৌশলীদের প্রধান ভূমিকা পালন করতে হয়। বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশে প্রকৌশল শিক্ষার বিষয়টি যথেষ্ট গুরুত্বের চোখে দেখা হয়। আমাদের দেশে প্রকৌশল ও কারিগরী শিক্ষা কার্যক্রম প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করে এসেছে। দেশে এই প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়টি হচ্ছে এই ধরনের সর্বোচ্চ শিক্ষায়তন। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আজঅবধি সুদীর্ঘ ত্রিশ বছরের অধিক সময় পেরিয়ে এসেছে। এই সময় এর আয়তন ও কলেবর বেড়েছে, নানা ধরনের নতুন নতুন অবকাঠামো গড়ে উঠেছে। শিক্ষা কার্য্যক্রমও দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে। সেই সংগে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়েছে। শিক্ষক কর্মকর্তাদের সংখ্যাও আনুপাতিক হারে বেড়েছে। গবেষণালব্ধ নানা কর্মসূচীও হাতে নেয়া হয়েছে। শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডেও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী তাদের মূল্যবান অবদান রেখে চলছেন। নিঃসন্দেহে এই প্রতিষ্ঠান দেশের এক গর্বিত সম্পদ। আগামীতে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ যে জরুরী হয়ে দেখা দেবে তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। যে কোন উন্নয়নে সামাজিক দিকটি মুখ্য হয়ে দেখা দেয়। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় একটি স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সরকারী বরাদ্দ ও অনুদান এখানে আয়ের প্রধান উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যে কোন দেশে এর অন্যথা কল্পনা করা যায় না। কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে সরকারী বরাদ্দ যা করা হচ্ছে তাকে অপ্রতুলই বলা চলে। প্রকৌশল শিক্ষার গুরুত্বকে অবহেলা করা কোন ক্রমেই আমাদের পক্ষে সংগত নয়। আমাদের সীমাহীন